চিকিৎসকের আত্মকথন

সবুজ বিশ্বাস

পুনশ্চ

ভূমিকা

ব্যস্ত চিকিৎসক তিনি। আজ দেশে তো কাল বিদেশে। এখানে পেপার পড়া, সেখানে পেপার পড়া। সংবর্ধনা। শংকর নেত্রালয়ের মহাদায়িত্ব থেকে দু-চার দিনের অব্যাহতি নিয়ে এভাবেই তাঁকে দেশ-বিদেশে ঘুরতে হয়। বিশ্বখ্যাত চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানে, প্রথিতযশা চক্ষু চিকিৎসকদের সম্মেলনে বা সংগঠনে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়। নতুন, নতুনতর কত তথ্য। আলোকিত হয় চক্ষু-গবেষণা ও চিকিৎসা। চমৎকার বলেন তিনি। চারিদিকে স্তব্ধতা। পিন পড়লেও বুঝি শব্দ হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসুজন মগ্ন হয়ে নিশ্চিত তাঁর বক্তৃতা শুনছেন, এ ভাবনার মধ্যে অস্বাভাবিকতা নেই, বরং বলা যায়, এটাই প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক। চোখ নিয়ে যাঁদের চর্চা, তাঁকে ঘিরে তাঁদের মুগ্ধতা-বিস্ময়ের শেষ নেই। সে সব নিয়ে অবশ্য তিনি মাথা ঘামান না। পেপার পড়া বা বক্তৃতা দেওয়ার শেষে হাততালি-প্রশংসা-স্তুতি সব দূরে সরিয়ে, পরের উড়ান না ধরে তিনি ইতিউতি বেরিয়ে পড়েন। চারপাশে কোথায় কী দ্রষ্টব্য, মনোযোগ সহকারে সেসব দেখেন। শুধু দেখেন না, যিনি যুবক-বয়স থেকে দক্ষিণী-জীবনে অভ্যস্ত, সেই তিনি-ই দেশ দেখার, মানুষ দেখার অভিজ্ঞতা ঝরঝরে বাংলায় লিপিবদ্ধ করে রাখেন। পেশাগত কারণে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে প্রতিদিনই চেন্নাইয়ের শংকর নেত্রালয়ে রোগী আসে, তাদের আলো-আঁধারির জীবন নিয়েও তাঁর লিখতে সাধ হয়। ব্যস্ততার মধ্যেও একটু সময় করে সেসব লিখে ফেলেন। অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরে আসার আখ্যান, কখনো বা অন্ধকারে তলিয়ে হারিয়ে যাওয়ার আখ্যান। সেসব অনেক মানুষকে জানাতে ইচ্ছে করে তাঁর, তাই আপন খেয়ালে লিখে রাখেন। লেখার পর লেখা। লেখা জমতেই থাকে। জমতে জমতে বই হয়। একটি নয়, তিন- তিনটি বইয়ের প্রণেতা তিনি।

আমরা যাঁর কথা বলছি, যাঁকে নিয়ে আমার এক প্যারা লেখা হয়ে গেল, তিনি যে ভারত-বিখ্যাত চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. জ্যোতির্ময় বিশ্বাস, তা অন্তত বইটি হাতে নিয়ে কারও বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তাঁর সঙ্গে মেরিনা বিচে আমি হেঁটেছি। চেন্নাইয়ের বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের মঞ্চে পাশাপাশি বসে অনুষ্ঠানে, আলোচনায় অংশ নিয়েছি, আবার কখনো গাড়িতে আমাকে নিয়ে

তিনি বেরিয়ে পড়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে চোখ জুড়োনো মন্দিরে। সেখানে পৌঁছে বিস্ময়ের শেষ থাকে না, বেলুড় মঠের নিখুঁত-অনুকরণে ভারি সুন্দর এক মন্দির! রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত সে মন্দিরে তখন পূজার্চনা চলেছে।

বছর কুড়ি আগে ডা. জ্যোতির্ময় বিশ্বাসের সঙ্গে চেন্নাইতে প্রথম সাক্ষাৎ। আমার স্ত্রীর চোখের সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। প্রথম সাক্ষাতেই অদ্ভুত এক ভালো লাগা। গভীর মুগ্ধতা। ভারতবর্ষের সুপরিচিত চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ, অথচ কী সাদামাঠা। নিরহংকারী। খুব সহজেই আপন করে নিতে পারেন। ভেতরে রয়েছে কবিতার প্রতি নিগূঢ় ভালোবাসা। চমৎকার আবৃত্তি করেন। প্রথম আলাপচারিতাতেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁর সাহিত্য-প্রীতি, সংস্কৃতিমনস্কতার কোনো তুলনা হয় না। সেই শুরু, স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যাপারে এরপর কতবার যে চেন্নাই গিয়েছি! কাজে-কর্মে কলকাতায় এলে প্রতিবারই তিনি কলকাতার শংকর নেত্রালয়ে আমার স্ত্রীকে যত্ন করে দেখে দিয়েছেন। আমাদের বাড়িতে এসেছেন। তৈরি হয়েছে আত্মিক সম্পর্ক। হয়ে উঠেছেন ‘প্রাণের মানুষ’। ডা. জ্যোতির্ময় বিশ্বাসকে ঘিরে কত স্মৃতি, যা মনের কোনায় সারাক্ষণই জেগে আছে। ফোনে দু-দণ্ড কথা হলে, চেন্নাই কলকাতায় যেখানেই সাক্ষাৎ হোক না কেন, তাঁকে দেখলেই আমার মন ভালো হয়ে যায়। গাইতে ইচ্ছে করে রবি ঠাকুরের সেই গান। কী গান, তা আর নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না। ‘ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময় / তোমারি হউক জয়। /তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়, /তোমারি হউক জয়।’

ভারত-বিখ্যাত ডাক্তার জ্যোতির্ময় বিশ্বাস যখন কলম ধরেন, তখন তিনি ‘সবুজ বিশ্বাস’। এই ডাকনামটি বড়ো মানানসই হয়ে ওঠে তাঁর লেখায়। সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে তিনি সবসময়ই সবুজের সজীবতায় উজ্জীবিত। পাই প্রাণের স্পর্শ। শুধু মনে সবুজ জেগে থাকে না, তাঁর লেখাও সজীব ও সপ্রাণ। ছবির পর ছবি। শব্দ দিয়ে বানানো ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। কোনোটি আনন্দময়, আবার কোনোটি বিষাদ-মলিন। হাসিতে খুশিতে যেমন মন ভরে ওঠে, তেমনই আবার মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতা আমাদের বেদনাকাতর করে। মানুষের বিপন্নতা কষ্ট দেয়। কত মানুষ কত কষ্টে আছে, চোখের অসুখে হয়তো আঁধার নেমেছে জীবনে। সেসব ভাবলে আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়। বেশ কয়েকটি লেখায় আছে এমনতরো বর্ণনা। ডা. জ্যোতির্ময় বিশ্বাসের উপস্থাপনে আন্তরিকতা ও সহমর্মিতা মিশে থাকে। প্রয়োজনে হাস্যরসও। চেষ্টাকৃত হাসানো নয়, ভেতর থেকে উঠে আসা। ফলে পড়তে ভালো লাগে, উপভোগ্য হয়ে ওঠে। স্বাদু গদ্যভাষা সবুজ বিশ্বাসের আড়ালে থাকা ডা. জ্যোতির্ময় বিশ্বাসের করায়ত্ত। তিনি যে বিষয় নিয়ে লিখুন না কেন, তা আমাদের আকৃষ্ট করে।

‘চিকিৎসকের আত্মকথন’ বইটির প্রথম লেখার শিরোনাম ‘চোখের আলোয় দেখেছিলাম চোখের বাহিরে’। রবীন্দ্রনাথের গানের পঙ্‌ক্তিটির আশ্চর্য-সুন্দর ব্যবহার চমকিত করে। রবীন্দ্রনাথ যে ডা. জ্যোতির্ময় বিশ্বাসের জীবনের পরতে পরতে রয়েছেন, তা আরও কয়েকটি লেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর অনুভূতিতে, উপলব্ধিতে কবি চিরজাগ্রত। ডা. জ্যোতির্ময় বিশ্বাসের অন্তর উৎসারিত

এই রবীন্দ্রপ্রেম তাঁর বেশ কয়েকটি লেখাকে ভিন্নতর মাত্রা দিয়েছে। একজন হৃদয়বান চোখের ডাক্তার হিসেবে রোগীদের মনের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেন তিনি। রোগীও পরম নির্ভরতায় নিজেকে মেলে ধরে। ভারত-বিখ্যাত ডাক্তারবাবুটি সব সময় রোগীকে সত্য অকপটে বলতে পারেন, তা নয়। সত্যটিকে কৌশলে এড়িয়ে রোগীর মনে আশা জাগিয়ে রাখেন। মানসিকভাবে রোগীকে ভালো রাখার জাদুমন্ত্র যে ডা. জ্যোতির্ময় বিশ্বাস জানেন, অহরহ তার বাস্তব প্রয়োগ ঘটান, এ বইয়ের বেশ কয়েকটি লেখায় সে দৃষ্টান্ত রয়েছে। বইয়ের একটি রচনার শিরোনাম 'নমো নমো নমো বাংলাদেশ মম'। লেখাটি বাংলাদেশ ভ্রমণের। তাঁর অধিকাংশ ভ্রমণেই কর্মজগতের আহ্বান থাকে। যেমন, বাংলাদেশে গিয়েছিলেন ইউভিআইটিস সোসাইটির উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে যোগদানের আহ্বানে। সেখানে গিয়ে যে আন্তরিক সংবর্ধনা পেয়েছিলেন, সে বিবরণ পড়তে পড়তে আমাদেরও মন ভালো হয়ে যায়। সুদীর্ঘকাল প্রবাসে থাকা ডা. জ্যোতির্ময় বিশ্বাসের কত গভীর ভালোবাসা বাংলা ভাষা ও বাঙালির প্রতি আজও রয়ে গেছে, তা এই লেখায় ফুটে উঠেছে। এমন ভালোবাসা তাঁর মনে রয়ে গেছে এ বঙ্গের জন্যও। এ বঙ্গেই তাঁর জন্ম। কৃষ্ণনগরের অদূরে বাতকুল্লায় জন্ম, বেড়ে ওঠা। কলকাতায় পড়াশোনা। এমবিবিএস পড়েছেন কলকাতা মেডিকেল কলেজে। সামনে তখন প্রসারিত পথ। সুদূরের হাতছানি। সাফল্যের সোপান পেরুতে পেরুতে এগিয়েছেন লক্ষ্যপূরণের পথে। চণ্ডিগড়ে, চেন্নাইতে, শেষে আমেরিকায়। সাফল্যের আকাশ ছুঁয়েছেন তিনি। আমেরিকায় দু'বছর উচ্চশিক্ষা, নিজেকে আরও আরও তৈরি করা, তারপর 'ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা', স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। এদেশে ফিরে যোগ দিয়েছেন চেন্নাইয়ের শংকর নেত্রালয়ে। আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। তারপর থেকেই তামিলনাড়ুতে বাস। মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতি বিজড়িত মাদ্রাজ-শহর তাঁর কর্মভূমি হয়ে ওঠা সত্ত্বেও সেভাবে আর বাংলা ভাষা চর্চার সুযোগ রইল না। একদা কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যে 'সবুজ বিশ্বাস' নামটি অতীব পরিচিত ছিল, ওই তরুণ-বয়সেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন বাচিকশিল্পে, সেই 'সবুজ বিশ্বাস' ডাক্তার জ্যোতির্ময় বিশ্বাস হয়ে অজস্র রোগীর চোখের আলো, মুখের আলো ফিরিয়ে দিলেন। কালো থমথমে মুখে বিপন্ন রোগীরা আসে, চিকিৎসান্তে আলো-ছলমল মুখে যখন ফিরে যায়, তখন সাফল্যের মিনার ছোঁয়া এই ডাক্তারবাবুটির মন নিশ্চিতভাবে ভরে ওঠে। রোগীদের নিরাময় করা, নতুন নতুন গবেষণায় মগ্ন থাকা, না, এখানেই তিনি থেমে থাকেননি। প্রবাসে মুষ্টিমেয় বাঙালিজনকে একত্রিত করেছেন, বাংলার ও বাঙালির সংস্কৃতিকে প্রবাসী-জীবনে আঁকড়ে থেকেছেন। জন্মভূমি-বঙ্গভূমির প্রতি, শহর-কলকাতার প্রতি গোপনে মনের কোণে আকুলতা-কাতরতা রয়েই গিয়েছে। এই নিখাদ ভালোবাসা গ্রন্থিত বহু লেখাতেই স্পষ্ট। শুধু স্পষ্ট নয়, স্পর্শময়ও। আমাদের ছুঁয়ে যায়, মন খারাপ হয়। অন্তর উৎসাহিত এই ভালোবাসা আছে বলেই এই লেখাগুলি এভাবে তাঁর কলমে ধরা দিয়েছে। ডা. জ্যোতির্ময় বিশ্বাসের তরুণ বয়সের গল্প শুনতে আমাদেরও ভালো লাগে। সে সময় এই শহরের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল কেমন ছিল, তা সহজেই আঁচ করতে পারা যায়।

ডা. জ্যোতির্ময় বিশ্বাসের কলমের জোর গ্রন্থিত লেখাগুলিতে ধরা পড়েছে। তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার শুধু সমৃদ্ধ নয়, বৈচিত্র্যময়ও। লেখাগুলি পড়তে পড়তে তাঁর মরমি মনের হদিস পাওয়া যায়। এমন সহমর্মী হৃদয়বান ডাক্তারবাবুর সংখ্যা এই শহরে অন্তত কমছে। কখনো কখনো তাই তাঁকে আমার 'স্বপ্নের ডাক্তারবাবু' মনে হয়। আমাদের শহরে, রাজ্যে কী নেই, তা না ভেবে আমরা অন্তত এই স্বস্তি পেতে পারি, ডা. বিশ্বাস বাংলাকে ভালোবাসেন, বাঙালিকে ভালোবাসেন। বাংলা ভাষায় লেখেন, চেন্নাইতে বাঙালিসমাজের অনুষ্ঠানে আজও উদাত্তকণ্ঠে বাংলা কবিতা শোনান। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনবরত তাঁর ডাক আসে। চোখ নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানে যে নিরন্তর চর্চা ও গবেষণা চলেছে, সেই কর্মযজ্ঞে ডা. জ্যোতির্ময় বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সম্ভ্রমের আসন তাঁর। একজন বঙ্গসন্তানের এই সাফল্য-স্বীকৃতি আমাদের অনেক কিছু না পাওয়ার বেদনা বোধহয় ভুলিয়ে দেয়। এই বইটির মধ্য দিয়ে ডা. বিশ্বাসের একটি অনালোকিত-অনালোচিত দিকে, তাঁর সাহিত্যচর্চায় আলো পড়বে। সেই আলোয় এই কৃতি বঙ্গসন্তানকে আমরা নতুন করে আবিষ্কার করব।

কলকাতা, ২০২৫ — পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

একজন সাধারণ চক্ষু চিকিৎসকের আত্মজীবনী	১৫
চোখের আলোয় দেখেছিলাম চোখের বাহিরে	১৮
নয়নে বারি ঝরে	২১
বাঙালি পেশেন্ট বাংলার বাইরে	২৩
হারানো ছাগল ও জনৈক চোখের ডাক্তার	২৭
কেমন হবে চিকিৎসা, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে?	৩৩
ডাক্তারদের কি পেশেন্টদের কাছ থেকে গিফট নেওয়া উচিত?	৩৭
বিজ্ঞানী ও আজকের দুনিয়া	৪০
হিউম্যান জিনোম আমাদের মানবজাতির জন্মপত্রিকা	৪৪
সায়েন্টিফিক কনফারেন্স ও স্যামসোনাইট ব্রিফকেস	৪৬
ওয়ার্ল্ড এইডস ডে এবং বিপুল ও বিপ্লব	৪৯
রোগটা যখন ক্যান্সার	৫৩
যারা যাবার তারা যাবেই, যারা থাকে তারাই জেনেছে বাঁ-হাতের উলটো পিঠ দিয়ে দুঃখকে মুছে সুখ আনতে হয়	৫৬
জীবনানন্দ ও চব্বিশ বছর আগের একদিন	৬৫
মাগে প্রতিকার উত্তর দাও আদি পিতা ভগবান	৬৭
নমো নমো নমো, বাংলাদেশ মম	৭২
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নহি	৭৭
আমার না ব্যবহার করা ডায়েরি	৭৯
ভুল লোক	৮২
কাজের লোক	৮৭
হোয়াই ইউ ওয়ান্ট টু উইন	৯৩
কৌন বনেগা ক্রোড়পতি	৯৮
হ্যাভ এ নাইস ট্রিপ	১০২
জনৈক বঙ্গসন্তানের তামিল শিক্ষার ব্যর্থ প্রয়াসের কাহিনি	১০৯
কেবলই টিভি এবং কেব্‌ল টিভি	১১২
প্লিজ চেক দ্য নাম্বার অ্যান্ড কল এগেন	১১৭

তিন চাকার যান	১২৪
মুঠোফোনে মুঠোবন্দি	১২৯
হাতে লেখা চিঠি বনাম ই-মেল	১৩২
ভাটুরা জংশন	১৩৭
ওয়েনাডে বিবাহবার্ষিকী	১৩৯
ভূস্বর্গ কাশ্মীর	১৪৩
সিকিম ঘুরে এলাম	১৪৬
পুট্টাপরথিতে ছ'দিন	১৫২
ডাবলিনে পাঁচ দিন	১৫৪
প্যাসাডিনার বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ	১৫৯
আননি ইয়োংগি বুসান	১৬৫
কনফারেন্স	১৬৮
কেনিয়ার বনে-জঙ্গলে	১৭০
এফারিস্টো গ্রিস	১৭৭
কোয়ালা ও ব্রিসবেনে পাঁচ দিন	১৮০
ছিয়াত্তরের অলিম্পিক শহর মন্ট্রিল	১৮৬
ডোন্ট ক্রাই ফর মি আর্জেন্টিনা	১৯০
টোকিওতে সাত দিন	১৯৯
কাও সিয়াং তাইওয়ান	২০২
তেল আভিভ ও জেরুজালেম	২০৫
সিয়েম রিপ ও আঙ্কোর	২০৮
এমারাল্ড সিটি সিয়াটলে আট দিন	২১১
প্যারিস, ইউট্রেক্ট, আর্মস্টারডাম, ব্রাসেলস	২১৫
হংকং-এ ছ'মাস	২২২
হোয়াটসঅ্যাপ, হোয়াটস ডাউন	২২৪
পার্কে প্রতিদিন	২২৬
নবমীর দিনটা	২২৯
পুজো সুদূর পরবাসে	২৩১
কেমন হবে পুজো একশো বছর পর	২৩৪
দোজ হু লস্ট ফলো আপ	২৩৭
পরিশিষ্ট	২৪১

আমার কথা

আমি একজন চোখের ডাক্তার। চোখের চিকিৎসা আর চোখের রোগের উপর গবেষণা আমার কাজ। এটাই আমার প্রথম এবং প্রধান পরিচয়। বেশিরভাগ সময়ে চোখের বিজ্ঞান নিয়ে পেপার লিখি। তবু ব্যস্ত কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে বিজ্ঞানের বাইরেও একটু-আধটু লিখতে ইচ্ছে হয়। মূলত ডাক্তারি-জীবনের ছোটোখাটো ঘটনা, ছোটোখাটো স্মৃতি। যা অমল-মধুর। সেগুলো লিখে ফেলি কখনো কখনো। দেখতে দেখতে একসময় দেখি বেশ কিছু লেখা জমা হয়ে গেছে। কিছু ছাপা হয়েছে পুজো স্যুভেনিয়রে। হারিয়েও গিয়েছে কিছু। দেবাশিস দাস এসেছিল কলকাতা থেকে অপথ্যালমোলজিতে ডিপ্লোমা করতে। ওঁর উৎসাহে আমার প্রথম বই বের হয়। সে বইয়ের নাম 'হারানো ছাগল ও জনৈক চোখের ডাক্তার'। রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন (সুবীর মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে) বইটা এক কপিও বিক্রি করিনি। পড়তে দিয়েছিলাম কিছু লোককে। পড়ে তাঁরা ভালো বলেছিল। তাঁরা সবাই ছিল কাছের লোক। তাই বিশেষ গা করিনি। তাদের আশকারা পেয়ে আরও কিছু জমে যাওয়া লেখা নিয়ে বের করলাম দ্বিতীয় বই, 'আমার না ব্যবহার করা ডায়েরি'। তাতে ছিল রোজকার জীবনের লোকেদের নিয়ে লেখা। আর ছিল আমার আবৃত্তিজীবনের কিছু ঘটনা নিয়ে কিছু লেখা। সাদামাটা প্রকাশনা। লোকেরা পড়ে ভালো বলতে শুরু করল। নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন থেকে জুটে গেল শ্রীমতী সুনীতিবালা স্বর্ণপুরস্কার। বিজ্ঞানের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তারপর বেশ কিছুদিন তেমন লেখা হয়ে ওঠেনি। বিজ্ঞানের সুত্রে কনফারেন্সে যেতে হয় দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ। মিটিংয়ের শেষে একটু ঘোরা, যাকে বলে রথ দেখার সাথে একটু কলা বেচা। তাই নিয়ে বেশ কিছু ভ্রমণকাহিনি জাতীয় লেখা লিখে ফেলেছিলাম। আমার অগ্রজপ্রতিম কলকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের চোখের ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর ডা. জ্যোতির্ময় দত্ত ওই সব লেখা নিয়ে একটা বই বের করে দিলেন। সে বইয়ের নাম 'পার্কে প্রতিদিন'। বইটা দে'জ থেকে বেরিয়েছিল। কপিগুলো একে ওকে দিতে দিতে শেষ হয়ে এসেছিল। বন্ধুবর ও সতত শুভাকাঙ্ক্ষী প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক ও গবেষক ড. পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও প্রেরণায় তিনটে বইকে একসঙ্গে করে এবং আরও নতুন কিছু জমে থাকা লেখা যোগ করে এক মলাটে এই নতুন বই। লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পাবার বাসনা নিয়ে নয়, কারও হয়তো ভালো লাগতে পারে, এই ভেবে এই প্রকাশনা।

আমার জীবনে যাঁর ভূমিকা সব থেকে বেশি, তিনি হলেন আমার মা। উনিই আমার একমাত্র দেবতা। আমার জীবনে যদি কিছু সাফল্য এসে থাকে তার উৎসমূল কোথায় তা আমি জানি। মা বলতেন, 'কখনো ভয় পাবি না, সব ব্যাপারে অংশ নিবি।' মা'র ওই কথাগুলো মনে রেখে সব জায়গায় এগিয়ে গিয়েছি। ভয় পাইনি কোথাও। নদীয়ার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইন্সটিটিউট চণ্ডীগড়, শঙ্কর নেত্রালয় মাদ্রাজ, ইউনিভার্সিটি অফ সাউদারন ক্যালিফোর্নিয়া সব জায়গায় মায়ের ওই ছোট্ট কয়েকটি কথা মনে রেখে এগিয়ে গিয়েছি। সর্বত্র, সব সময়ের সঙ্গী ছিলেন তিনি। এখনও আছেন। আজ মা সশরীরে নেই। তবু তাঁর উপস্থিতি টের পাই সবসময়। যেন বলছেন, 'ভয় পাবি না।' না, ভয় পাইনি। দেশে, বিদেশে, সেমিনারে, কনফারেন্সে, আবৃত্তির মঞ্চে, সভাগৃহে। এই বইটি মা'র চরণে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য। দু'ফোঁটা অশ্রুর সাথে এই যৎসামান্য শ্রদ্ধার্ঘ্য রাখলাম তোমার পায়ের উপরে মা। ফুলের বদলে।

সবুজ বিশ্বাস

একজন সাধারণ চক্ষু চিকিৎসকের আত্মজীবনী

আমি জানি আত্মজীবনী সাধারণত যাঁরা লিখে থাকেন তাঁরা হলেন বড় পলিটিকাল লিডার কিংবা দেশের প্রেসিডেন্ট, বড় ফুটবল বা ক্রিকেট খেলোয়াড়, ফিল্মস্টার, এমনকি তিনি হতে পারেন সি বি আই অফিসার মায় ইলেকশন কমিশনার পর্যন্ত। বিখ্যাত লেখক নীরদ সি চৌধুরী লিখেছিলেন 'অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান', এইসব অটোবায়োগ্রাফি অনেক সময় চাঞ্চল্যকর তথ্য কিম্বা বিতর্কিত সম্পর্ক ফাঁস করে যা জনগণের মধ্যে শোরগোল তোলে। আসলে এইসব কন্ট্রোভারসি থাকলে বইয়ের বিক্রি বাড়ে। আমি এই আত্মজীবনী লিখেছি কোনো কন্ট্রোভারসি তৈরি করবার জন্য নয় বা কাউকে জ্ঞান দেবার জন্য নয়। জ্ঞানত আমার জানা নেই আজ অবধি কোনো ইউভিয়াইটিস স্পেশালিস্ট তাঁর আত্মজীবনী লিখেছেন কিনা। সম্ভবত তাদের জীবনটার অধিকাংশ সময় কেটে যায় চোখের সামনের অ্যাকোয়াস হিউমারের ঘোলাটে জলে বা পিছনের ভিট্রিয়াস হিউমারের অস্বচ্ছতার মধ্যে।

সেটা ছিল ১৯৮৫ সাল। ভিট্রিওরেটিনাল সার্জারিতে ফেলোশিপ করে কোথায় ভিট্রিওরেটিনা সার্জন হব, বেছে নিলাম ইউভিয়াইটিস, যা হচ্ছে চোখের মিডল লেয়ারের ইনফ্লামেশন। গ্রিকরা এর নাম দিয়েছিলেন ইউভিয়া অর্থাৎ 'গ্রেপস' বা 'আঙুর'। আঙুর আমি যে ভালোবাসি না তা নয়। কিন্তু আঙুর ফল সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালির মতো কেনবার ক্ষমতা না থাকায় ওটাকে আমার কাছে সবসময় টকই মনে হত। এই ইউভিয়া শরীরের বিভিন্ন রকম রোগে আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু অসুবিধা হল যে সেটা ধরা মোটেই সহজ কাজ নয়। গুচ্ছের টেস্ট করেও তার হদিস পাবেন না আপনি। পেশেন্টরা অনেকেই এটা ভেবে গর্ব বোধ করেন তাদের এমন অসুখ হয়েছে যে ডাক্তার পর্যন্ত ধরতে পারছেন না।তার উপর মুশকিল হচ্ছে যে আপনাকে অন্তত তিরিশটারও উপর রিপোর্ট দেখতে হবে। আপনি এড়াতে চাইলে পেশেন্ট ঠিক বলবে, 'ডাক্তার সাব আপনে মেরা ইউরিন কা রিপোর্ট নেহি দেখা'। যখন আপনি বলবেন আপনি ওঁর ইউভিয়াইটিসের কারণটা ধরতে পারছেন না তখন ওনারা খুব খুশি হয়েই ক্লুটা ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন তা আপনি চান বা না চান। একজন পেশেন্ট আমাকে বলেছিলেন তাঁর ইউভিয়াইটিস অ্যাট্যাক শুরু হয় মাউন্ট রোডের একটা দোকানের লস্যি খাবার পর। লস্যির দোকানটার একদম সঠিক ঠিকানাও দিয়েছিলেন তিনি। ওনার ধারণা আমি যদি ওঁর ব্লাড, ইউরিন, স্টুল স্যাম্পলের সঙ্গে বা এমনকি তার বদলে যদি ওই লস্যি স্যাম্পল টেস্ট করি তাহলে আমি ঠিক ওঁর ইউভিয়াইটিসের কারণটা ধরতে পারব। আমার পূর্বসূরি কোনো ইউভিয়াইটিস স্পেশালিস্ট এরকম কোনো সূত্র পেয়েছেন কখনো এমন খবর আমার জানা নেই। এটা ওনাকে বলাতে উনি আরও উৎসাহিত হয়ে জানালেন যে আমি অবশ্যই ওঁর সঙ্গে ওই লস্যির দোকানে যাই। উনি আমি রেডি থাকলে উনি আমাকে এখনই নিয়ে যেতে রাজি।

আমার মনে আছে আর একজন হিন্দিভাষী পেশেন্ট এর থেকেও মারাত্মক ক্লু দিয়েছিলেন, যা আমার সাবজেক্টের স্বনামধন্য গুরু প্রফেসর অ্যালান সি উড পর্যন্ত লেখেননি। ওঁর গল্পটা বলি। ভদ্রলোক বছর পয়তাল্লিশের হবে। উনি এসেছিলেন ইউভিয়াইটিসের একটা অ্যাকুট অ্যাটাক নিয়ে। উনি যা বলেছিলেন তা ওনার কথাতেই লিখছি। 'ডাক্তার সাব, কাল তক মেরা আঁখ আচ্ছা থা। কাল রাত মে পার্টি মে গিয়া, সব নে কহা, আরে তেরা আঁখ ইতনা আচ্ছা হ্যায়, ইতনা উমর মে চশমা ভি নেহি লাগতা হ্যায়। সুবহ মে উঠা ত দেখা মেরা দোনো আঁখ পুরা লাল হো গিয়া, পানি গিরনে লাগা। জরুর কিসি নে মেরা আঁখ মে আঁখ ডাল দিয়া'। আমার পড়া কোনো টেক্সট বুকে ইউভিয়াইটিসের এরকম কোনো কারণের কথা লেখা নেই। প্রফেসর অ্যালান সি উড বেঁচে থাকলে ওনাকে জিজ্ঞাসা করে নিতাম। আমি ওনাকে বলেছিলাম হয়তো আপনার কোনো কোলাজেন ডিজিজ আছে যা এই মুহূর্তে ধরা পড়ছে না। জানি না উনি আমার কথাটায় কতটা বিশ্বাস করেছিলেন। তবে আমার ধারণা ওনার রোগের কারণ উনি নিজেই বের করে নিয়েছেন।

কিন্তু মি. শিভরামকৃষনান এরকমভাবে আমার কথাকে ধরে নেবেন বুঝতে পারিনি। শিভরামকৃষনান এসেছিলেন চেন্নাই থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে থিরুভান্নামালাই থেকে ওর সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে। এই নিয়ে তিনবার ওর বউয়ের চোখে ইউভিয়াইটিসের অ্যাটাক হয়েছে। শিভরামকৃষনান বার বার ওই একটা কথাই জানতে চাইছিল কেন ওর বউয়ের চোখে বার বার ইউভিয়াইটিসের অ্যাটাক আসছে। হোয়াই কামিং এগেইন অ্যান্ড এগেইন স্যার? বইয়ে পড়া সামাণ্য বিদ্যা থেকে বলেছিলাম, 'ইউ নো সামটাইমস স্ট্রেস ক্যান ট্রিগার সাচ অ্যাটাক। শিভরামকৃষনান সঙ্গে সঙ্গে স্লিপ ফিল্ডার যেমন ব্যাটসম্যানের ব্যাটের থেকে ক্যাচ লুফে নেয় ঠিক তেমনি ভাবে আমার কথাটা লুফে নিল মনে হোল। 'ইউ আর রাইট ডক্টর, মাই মাদার অল ওয়েজ ফাইন্ডস ফল্ট উইথ হার'। আমি বুঝতে পারিনি আমার কথা এরকম ভাবে নেবেন মি. শিভরামকৃষনান। ন মাস পরে ওর বউয়ের যখন ফোরথ অ্যাটাক হল শিভরামকৃষনান প্রথমেই ওর মাকে ওর ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমার রুমে ঢুকে প্রথমেই শিভরামকৃষনান বললেন, 'ডক্টর, আই হ্যাভ সেনট মাই মাদার টু মাই ব্রাদারস প্লেস, দেয়ার উইল বি নো মোর ট্রিগার অফ স্ট্রেস'। ও বলতে চাইছিল ওর পক্ষে যা করার ও করে ফেলেছে। এখন আমার দায়িত্ব ওর বউয়ের ইউভিয়াইটিস সম্পূর্ণ নির্মূল করা। 'ওহ গড' শুধু ওই একটা শব্দই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

মিসেস সারাদাম্মালের ক্ষেত্রেও আমি ভুল করেছিলাম। ওনার চোখের অসুখটা ছিল কোরয়ডাইটিস (choroiditis)। চোখের মিডল লেয়ারের পিছনের দিকটা এই রোগে আক্রান্ত হয়। এর ফলে ইন্ডিয়ান রাস্তার মতো খানা খন্দ তৈরি হয় ঘা শুকিয়ে যাবার পর। এটা যদি চোখের সেন্ট্রাল এরিয়া যাকে বলে ম্যাকুলা এফেক্ট করে, তা হলে পেশেন্টের অনেকটা দৃষ্টিই চলে যায়। এর ও কারণ বের করা খুব কঠিন। আমার পূর্বসূরি ইউভিয়াইটিস এক্সপার্টরা বিশ্বাস করতেন এটা সম্ভবত কান, নাক, টনসিল, ব্লাডার, পেটের বা দাঁতের সেপটিক ফোকাস থেকে হতে পারে। তাই আমরা পেশেন্টদের জিজ্ঞাসা করতাম, 'ডু ইউ হ্যাভ ইনফেকশন ইন ইয়ার, ইন ইয়োর টিথ'? কিন্ত আমাদের দেশে শতকরা নব্বই ভাগ লোকেরই দাঁতের কিংবা পেটের গণ্ডগোল থাকে। আমার মেডিসিনের

টিচার বলতেন, 'টু বি অ্যান ইন্ডিয়ান ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ অ্যামিবা ইন দা স্টুল'। আর একটা দুটো খারাপ দাঁত তো সবারই আছে আমাদের। সত্যি কথা বলতে কী মিসেস সারাদাম্মালের বেশ কয়েকটা দাঁত খারাপ ছিল। ওর কোরয়ডাইটিসের কারণ খুঁজে বের করতে আমি ওনাকে একটা নামকরা ডেন্টিস্টের কাছে পাঠিয়েছিলাম। দু সপ্তাহ বাদে যখন মিসেস সারাদাম্মাল আমার ওপিডিতে আসলেন তখন ওনাকে চিনতেই পারিনি। সেই নামকরা ডেন্টিস্ট ওনার মুখের ভিতর ডেন্টাল সেপসিস পেয়ে বেশ কয়েকটা দাঁত তুলে দিয়েছিলেন। সারাদাম্মালের কোরয়ডাইটিসের ট্রিটমেন্ট করে সারিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু ওই ম্যাকুলার স্কার হয়ে যাওয়ায় দৃষ্টি ফেরানো যায়নি। যাওয়ার দিন মিসেস সারাদাম্মাল বলেছিলেন, 'ডক্টর আরলিয়ার আই লস্ট ভিসন বাট আই হ্যাড টিথ, বাট নাউ আই নাইদার হ্যাভ ভিসন নর মাই টিথ'। আমার মনে হয় বলি, ধরণী দ্বিধা হও।

সত্যি কথা বলতে কী কেউ জানে না কোনটা ইউভিয়াইটিস ট্রিগার করে, কোনটা করে না। এমন কি তাবড় ইউভিয়াইটিস বিশেষজ্ঞদের ও কারও জানা নেই। সেটাই মিসেস পিনাকী পাতিকে বলেছিলাম। প্রায় জলভরা চোখ নিয়ে মিসেস পাতি বলেছিল, ''সি স্যার, কতবার আমি ওকে বলেছি বাপী লাহিড়ীর হোল নাইট মিউজিক ফাংশনে যেয়ো না। আগের বার যাবার পর তোমার ইউভিয়াইটিস অ্যাটাক হয়েছিল। এবার যদি হয় মুশকিল হবে। তোমার একটাই চোখ। কে শোনে কার কথা। এখন দেখুন, পরের দিন, পরের দিন সকাল থেকেই চোখ লাল। ওই ইউভিয়াইটিস অ্যাটাক। এগজামিন করে দেখলাম মিসেস পাতি ভুল বলেননি। এখন প্রশ্ন সত্যি হল নাইট বাপী লাহিড়ীর মিউজিক আমদের ইমিউন সিস্টেমের ডিরেনজমেন্ট (Immune system derangement) করতে পারে? করতে পারে ইউভিয়াইটিস ট্রিগার? আমি বাপী লাহিড়ীর মিউজিক শুনিনি যে তা নয়। তবে সারা রাত শুনলে আমার ইমিউন সিস্টেমের উপর কোনো এফেক্ট হবে কিনা জানি না। মিস্টার পাতি সম্ভবত বাপী লাহিড়ীর ফ্যান। কিন্তু ওঁর গান সারা রাত্তির শুনলে ওনার ব্লাডের সাইটোকাইন (cytokine) লেভেলের কি অলটারেশন হবে বলা মুশকিল। আর তা থেকে কি ইউভিয়াইটিস ট্রিগার হতে পারে? উত্তরটা খুব মুশকিল। তবে সাইটোকাইন ইউভিয়াইটিস ট্রিগার করতে পারে। আমি মিসেস পাতির প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। আইডিয়ালি এর উত্তর জানতে গেলে মিস্টার পাতির ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইন লেভেল বাপী লাহিড়ীর গান শোনার আগে ও পরে মাপতে হবে। কে করে দেবে আমার জন্য সেই কাজটি?